বন-জ্যোৎস্না

জঙ্গলের মধ্যে জ্যোৎস্না পড়েছে।

দু'পাশে নিবিড় শালের বন। কিন্তু নিবিড় হলেও পত্রাচ্ছাদন লতাগুল্মের জটিল নয়—পাতার ফাঁকে ফাঁকে উঁকি দিয়েছে পূর্ণিমার চাঁদ। আলো-আঁধারির মায়ায় অপরূপ হয়ে আছে অরণ্য।

সরু পায়ে চলার পথ দিয়ে শিউকুমারী এগিয়ে চলেছিল। কাঁখের কলসী দেহের ললিত ছন্দে দোল খাচ্ছে—শুকনো শালের পাতা পায়ের নিচে যেন আনন্দে গান গেয়ে উঠেছে। এই সন্ধ্যায় একা জঙ্গলের পথ নিরাপদ নয়। বাঘ আছে, ভালুক আছে, হাতি আছে, নীল গাই আছে, বরা আছে—কী নেই এই বিশাল অরণ্যে? তবু শিউকুমারীর ভয় করে না। তা ছাড়া ডুয়ার্সের বাঘ নিতান্তই বৈষ্ণব, পারতপক্ষে তারা মানুষের গায়ে থাবা তোলে না, এমনি একটা জনশ্রুতিতেও এদেশের লোক প্রগাঢ়ভাবে আস্থাবান।

বনের মধ্য দিয়ে একা চলেছে শিউকুমারী। গায়ে রুপোর গয়নায় জ্যোৎস্নার ঝিলিক। জঙ্গলের বুকে একটা গভীর ক্ষত-চিহ্নের মতো বিসর্পিত রেখায় ঝোরার জল যেখানে বয়ে গেছে সেখানকার ঘন-বিন্যস্ত ঝোপের ভেতর থেকে উঠছে বুনো ফুলের গন্ধ। জ্যোৎস্নায় মাতাল হয়ে ডেকে চলেছে হরিয়াল—পূর্ণিমার রাত্রির মায়ায় তারও চোখ থেকে ঘুম দূর হয়ে গেছে। শুধু থেকে থেকে কোথায় তীব্র স্বরে চিৎকার করছে একটা ময়ূর—পাখা ঝটপট করছে, হয়তো বেকায়দায় পেয়ে কোথাও আক্রমণ করছে শিশু একটা পাইথনকে। অকৃপণ পূর্ণিমা আর অনাবরণ সৌন্দর্যের মধ্যেও আরণ্যকে আদিম হিংসা নিজেকে ভুলতে পারেনি হরিয়ালের সুরে আর ময়ূরের ডাকে রুদ্রমধুরের ঐক্যতান বেজে চলেছে।

জঙ্গল শেষ হতেই খরখরে বালি। পলি মাটির নরম কোমলতা নয়, মুক্তা-চূর্ণের মতো মিহি মখমল মসৃণ বালিও নয়। চূর্ণ পাথরের টুকরো এখানে কাঁকরের মতো ধারালো। ভরা বর্ষায় জলঢাকা যে সমস্ত পাথরের চাঙাড় হিমালয়ের বুক থেকে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল, অতিকায় কতগুলো কচ্ছপের মতো তার সেই বিশাল বালি বিস্তারের ওপরে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

ওপারে ভুটানের কালো পাহাড়। আর তলা দিয়ে ছেদহীন অনন্ত অরণ্য—ডুয়ার্স থেকে টেরাই। দুর্গমতার ওপারে প্রতিরোধের তর্জনীয়। দেবতাত্মা নাগাধিরাজের অলঙ্ঘ্য প্রাকার। আলোয় ধোয়া আকাশের নিচে পৃথিবীর বুক ঠেলে ওঠা কালো বিদ্রোহ। আর সামনে পাহাড়ি নদী জলঢাকা।

কতটুকু নদী, কতটুকু বা জল। বুক পর্যন্তও ডুববে কিনা সন্দেহ। দেখে মনে হয় পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। কিন্তু মনে হওয়া পর্যন্তই—শুধু হেঁটে পার হওয়া কেন নৌকাতেও পার হওয়া চলে না। ঘণ্টায় ত্রিশ মাইল বেড়ে দুর্দান্ত স্রোতে জল নেমে চলেছে, পাহাড় থেকে সমতলে, সমতল থেকে সমুদ্রে। স্বপ্ন থেকে হঠাৎ জাগা নির্ঝরের বজ্রগর্জন। জলের তলায় তলায় ঠেলে নিয়ে চলেছে বেলে পাথর আর গ্রানাইটের জগদ্দল স্তূপ। নিচে পাথরে পাথরে সংঘর্ষ—ওপারে খরখরে বালি ভেঙে জলের হুংকার। এতটুকু নদীর কলরোল এক মাইল দূর থেকেও কানে আসে।

জ্যোৎস্নায় ঝলসে যাচ্ছে জলঢাকা। শান্ত ঘুমন্ত আলোর বাঁকা তলোয়ার নয়। পাহাড়িরা যাকে সোনালি অজগর বলে এ যেন ঠিক তাই। ক্ষুধার্ত সোনালি অজগরের মতো গর্জন করে এঁকেবেঁকে ছুটে চলেছে—যেন মুখ থেকে ছিটকে পালিয়ে যাওয়া শিকারের সন্ধানে তার অভিযান।

কাঁখে কলসী নিয়ে শিউকুমারী স্থির হয়ে দাঁড়াল খানিকক্ষণ। পেছনে অরণ্য, ওপারে অরণ্য আর পাহাড়, মাঝখানে নদী! আকাশে চাঁদ।

ভারি খুশি লাগছে মনটা। আনন্দে গান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করছে। এমনি জ্যোৎস্না রাতেই তো 'পিতমে'র আসবার কথা! পাহাড়ের গা বেয়ে নেমেছে উৎরাইয়ের পথ। দু'ধারে শালের বন হাওয়ায় কাঁপছে। পাহাড়ি ঝাউয়ের একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। জংলী কলার পাতাগুলো কাঁপছে, কাঁপছে জ্যোৎস্নার রং মেখে। আর সেই পথ বেয়ে নামছে ঘোড়া, নেমে আসছে ঘোড়সওয়ার। খটখট খটাখট। বুকের রক্তে মাতলামির দোলা লেগেছে, সমস্ত শিরাস্নায়ু চকিত হয়ে উঠেছে অধীর এবং উদ্গ্রীব প্রতীক্ষায়। 'পিতম' আসছে অভিসারে।

একটা গানের কলি গুন গুন করে দু'পা এগিয়ে আসতে না-আসতেই আবার শিউকুমারীকে থেমে পড়তে হলো। আকাশের চাঁদে আর মায়াময় পৃথিবীতে মিলে বন-জ্যোৎস্নার যে অপূর্ব সুর বাজছিল—হঠাৎ সে সুর কেটে গেছে। ভয়ে আর আশঙ্কায় সমস্ত শরীর ছমছম করে উঠল।

জলের ধারে সাদামতো পড়ে আছে ওটা কী? পাথর? না—পাথর নয়। বিকেলেও শিউকুমারী ওখানে গা ধুয়ে গেছে, তখন তো ওটা ছিল না। আর এতটুকু সময়ের মধ্যে অত বড় একখানা পাথর তো আর হাওয়ার মুখে উড়ে আসেনি। তা হলে?

নিশ্চয় মানুষ। কিন্তু মানুষ এল কী করে? কেউ খুন করেছে নাকি? জানোয়ার মেরে দিয়েছে? দুটোই সম্ভব। ননরেগুলেটেড এরিয়া—আইনের বন্ধন এখানে

শিথিল; অরণ্য-রাজ্যে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে আরণ্যক মানুষেরাই, সে জন্য তাদের সদর-আদালতে ছুটে যেতে হয় না। আর সন্ধেবেলার দু-চারটে জানোয়ারের জলের কাছে আনাগোনাও খুব সম্ভব। বিশেষ করে ভালুকের আমদানিটা এ তল্লাটে এমনিতেই একটু বেশি।

কয়েক মুহূর্ত শিউকুমারী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কী করবে? এগিয়ে যাবে ওখানে? কে জানে কোনো অনিশ্চিত বিপদ ওখানে প্রতীক্ষা করে আছে কি না। এই জঙ্গল আর জনহীন নদীর ধার। এখানে বিপদ-আপদ এলে সে কী করতে পারে!

কিন্তু ইতস্তত করে লাভ নেই। দেখাই যাক না। ভুটানি মেয়ের নির্ভীক নিঃসংশয় মন আত্মস্থ হয়ে উঠল ক্রমশ। ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে গেল সে।

মানুষই বটে। কিন্তু বিদেশি—বাঙালি। জলের ধারে নিঃসাড় হয়ে পড়ে আছে! ভালুক খায়নি, তা হলে চোখ-নাক নিশ্চয় আস্ত থাকত না। গায়ে কোথাও রক্তের দাগ নেই—ক্ষতচিহ্ন নেই কোনোখানে। কাপড়টা গোছানোই আছে, সাদা জামাটায় সোনার বোতামগুলো আলোতে ঝিমিয়ে উঠছে। আর, আর—কী আশ্চর্য, মানুষটা মরেনি। সমস্ত শরীরে ঢেউয়ের মতো দোলা বড় বড় নিশ্বাস উঠছে আর, নিশ্বাস পড়ছে। কোনো কারণে অজ্ঞান হয়ে গেছে নিশ্চয়।

তারপর আর ভাবতে হলো না শিউকুমারীকে। কলসী ভরে সে জলঢাকার জ্যোৎস্নায় গলা তুহিন শীতের জল নিয়ে এল, সস্নেহে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল লোকটার পাশে। মুখে চোখে জল ছিটিয়ে একটুখানি উড়ানির হওয়া দিতেই অজ্ঞান মানুষের দীর্ঘায়ত ক্লান্ত নিশ্বাস ক্রমশ সহজ আর স্বাভাবিক হয়ে আসতে লাগল। আরো খানিক পরে চোখ মেলল মহীতোষ। বিহ্বল অর্থহীন দৃষ্টি। সমস্ত চিন্তা যেন মস্তিষ্কের মধ্যে অস্পষ্ট নীহারিকার মতো দ্রুত লয়ে আবর্তিত হয়ে চলেছে। খণ্ড খণ্ড, ছিন্ন ছিন্ন। রূপ নেই, আকার নেই, অর্থ-সঙ্গতি নেই।

আরো জোরে জোরো হাওয়া দিতে লাগল শিউকুমারী। আরো বেশি করে ছিটিয়ে দিলে জল! জলঢাকার বরফগলা স্পর্শে মরা-মানুষ চমক উঠতে পারে, আর মহীতোষ তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছে মাত্র। আস্তে আস্তে মহীতোষ উঠে বসল।

সামনে তরুণী নারী। উদ্বিগ্ন ব্যাকুল দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। তার কালো চোখে জ্যোৎস্না, সুন্দর মুখখানাতে জ্যোৎস্না, কর্ণাবরণের জ্যোৎস্না। পাশ দিয়ে তীব্র কলরোলে বয়ে যাচ্ছে জলঢাকা। পুলিশ নয়, পেছনে ছুটে-আসা শত্রুও নয়। গতিশীল, ভয়ত্রস্ত উদভ্রান্ত জীবনের সমস্ত চঞ্চলতা যেন এখানে এসে স্থির আর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে। আকাশ থেকে স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে কি পরী এসে নেমেছে তার পাশে? অপরিসীম ক্লান্তি আর অবসাদে কি শেষ পর্যন্ত মরে গেছে মহীতোষ, আর মৃত্যুর পর পৌঁছে গেছে একটা আশ্চর্য জগতে!

মর্মরশুভ্রা বিদেশিনী তরুণী। মূর্তির মতো অপলক দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে তার দিকে—বিস্ময় আর জিজ্ঞাসা একসঙ্গেই সে দৃষ্টির মধ্যে কথা কয়ে উঠেছে। কিন্তু মর্মরমূর্তি নয়, মানুষই বটে।

মহীতোষ বললে, আমি কোথায়?

হিন্দি-মেশানো বাঙলায় জবাব দিলে মেয়েটি : নদীর ধারে।

নদীর ধারে! মহীতোষের মনে পড়ে গেল। পালিয়ে আসছিল—সে আর অরবিন্দ! শালবনের মধ্যে অরবিন্দ কোথায় হারিয়ে গেল—তার আর সন্ধান মিলল না। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই, প্রতীক্ষা করার উপায় নেই। পালাও, পালাও, আরো জোরো পালিয়ে চলো। আগের দিন কিছু খাওয়া হয়নি, সারা রাতের মধ্যে চোখ বুজবার উপায় ছিল না একটিবারও। ক্ষিদে-তেষ্টায় সমস্ত শরীরটা অসাড় আর শিথিল হয়ে গেছে। তারপর ছুটতে ছুটতে সামনে পড়ল জল। পিপাসার্ত পশুর মতো সেদিকে ছুটে এল মহীতোষ। আরো পরে? আর কিছু মনে পড়ে না।

মেয়েটি আবার বললে, কী করে এলে এখানে?

জবাব দিল না মহীতোষ। কী জবাব দেবে, কেমন করে জবাব দেবে! অবসাদের ভারী, আচ্ছন্ন চোখ দুটো উদাসভাবে মেলে দিয়ে সে তাকিয়ে রইল ওপারের ঘনান্ধকার অরণ্য আর কালো পাহাড়ের অতিকায় দিগ্-বিস্তারের দিকে।

শিউকুমারী বললে, উঠতে পারবে? তা হলে চলো আমাদের ঘরে।

মহীতোষ তবুও ভাবছে। কোথায় যাবে সে? কোনখানে তাকে নিয়ে যাবে এই অপরিচিতা রহস্যময়ী মেয়েটি! কোন অজ্ঞাত পৃথিবীর আমন্ত্রণ তার দৃষ্টিতে?

মহীতোষ শেষ পর্যন্ত উঠেই দাঁড়াল। ক্লান্তিতে সর্বশরীর কাঁপছে, মাথাটা ঘুরে পড়তে চাইছে মাটিতে। এক কাঁখে কলসী করে আর একখানা হাত অসংকোচে শিউকুমারী এগিয়ে দিলে মহীতোষের দিকে: নাও, আমার হাত ধরে চলো।

অন্য সময় হলে দ্বিধা করতো মহীতোষ। সহজাত শিক্ষা আর সংস্কারের একটি অজানা অচেনা তরুণী মেয়ের শুভ্র হাতখানিকে আশ্রয় করার কল্পনাতেও রক্তে দোলা লেগে যেত! কিন্তু চেতনা তখনো সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে ওঠেনি। যেন অর্ধ তন্দ্রায়, অথবা পরিপূর্ণ স্বপ্নের মধ্যেই সে খেয়াল দেখছে। চাঁদের আলোয়, বালিতে জল-কল্লোলে আর বনের মর্মরে সমস্ত পৃথিবীটাই তো অবাস্তব হয়ে গেছে। মন এখানে প্রশ্ন করে না। দ্বিধা করে না। এমন একটা আশ্চর্য পটভূমিতে সবই সম্ভব, সবই স্বাভাবিক।

শিউকুমারীর ভিজে ঠাণ্ডা হাতটা আঁকড়ে ধরলেন মহীতোষ। সুগঠিত সুঠাম দেহের ওপর সমস্ত শরীরের ভারটাই এগিয়ে দিয়ে বালির ওপরে পা টেনেটেনে এগিয়ে চলল সে। একটা সুগন্ধ নাসারন্ধ্র বয়ে যেন তার রক্তের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে। কিন্তু সে গন্ধ মেয়েটির দেহ থেকে, অরণ্য থেকে, না আকাশের চাঁদ থেকে—মহীতোষ ঠিক বুঝতে পারল না।

বালিরেখা ছাড়িয়ে জঙ্গল। শালবনের ভেতর দিয়ে মানুষ, হরিণ আর ভালুকের চলার পথ। ঝরা শালপাতায় পদধ্বনির মর্মরিত প্রতিধ্বনি। ময়ূর ডাকছে না, কিন্তু হরিয়ালের মাদক সুর ভেসে যাচ্ছে বাতাসে। হিংস্র জানোয়ারের হুঙ্কার শোনা যাচ্ছে না কোথাও। চকিতের জন্য কানে এল হরিণের মিষ্টি আহ্বান! এমন অপূর্ব বন-জ্যোৎস্নায় সে হয়তো হরিণীকেই সন্ধান করে ফিরছে। কঁক-কক-কো। ঝোপের মধ্য থেকে অস্পষ্ট গদগদ ধ্বনি। বনমোরগ দম্পতি হয়তো মিলন-মায়ায় বিহ্বল হয়ে উঠেছে কোথাও।

বন-জ্যোৎস্না। শিউকুমালীর মনে পড়ে এমনি রাত্রে আসবে পিতম। জংলী কলার পাতায় পাতায় ছায়া কাঁপছে পাহাড়ি পথে। ঝাউয়ের বনে উদাস বিরহাতুর দীর্ঘশ্বাস। আর পাথরবাঁধা পথ দিয়ে শাদা ঘোড়ায় খট খট সোয়ারী হয়ে আসছে দূরবাসী প্রিয়তম—শালের কুঞ্জে বাসর-যাপন।

শিউকুমারী কি গুন গুন করে গান গাইছে? মহীতোষ কিছু বুঝতে পারছে না। চেতনা ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়ছে। এই জ্যোৎস্নায়, বনের এই সংগীতে এই রহস্যমধুর পথচলার ছন্দে! শিউকুমারীর গায়ের ওপর ভারটা ক্রমশ বেশি হয়ে চেপে পড়ছে। মহীতোষ আবার কি ঘুমিয়ে পড়ল, না অজ্ঞান হয়ে গেল একেবারে?

জঙ্গরের এদিকটা অনেকখানি ফাঁকা। ডি-ফরেস্টেশনের প্রভাবে জঙ্গল হালকা হয়ে গেছে—ওদিকে তো একেবারেই নেই। মানুষের কুঠারের বাঁটের জন্য। ক্ষত-বিক্ষত অরণ্য দিনের পর দিন হ্রস্ব হয়ে আসছে, অন্তিম প্রতিবাদে ছোট বড় গাছ আর একরাশ লতাগুল্ম দলিত করে লুটিয়ে পড়ছে বৃদ্ধ বনস্পতি, মানুষের অবিশ্রান্ত দাবির মুখে পৃথিবীর প্রথম অধিবাসীরা নিঃশব্দে আত্মদান করে চলেছে। শুধু ব্যথাতুর বুকের মধ্যে সঞ্চিত জ্বালা মাঝে মাঝে আত্মপ্রকাশ করে দাবানল হয়ে। সে এক অপরূপ দৃশ্য। শুকনো পাতার ধু-ধু শিখা জ্বালিয়ে আর লতাগুল্মকে পুড়িয়ে দিয়ে শাঁ শাঁ করে এদিক-ওদিকে সরীসৃপ গতিতে আগুনের প্রবাহ চলে জলস্রোতের মতো। এঁকেবেঁকে এগিয়ে যায়—সোজা চলতে চলতে হঠাৎ ডাইনে বাঁয়ে মোড় ঘোরে। বনানীর বুকের জ্বালা আগুনের সাপ হয়ে ছুটোছুটি করে! একদিন, দুদিন, তিনদিন—যে পর্যন্ত না শালবনের ডালে ময়ূরের পেখম ছড়িয়ে দিয়ে হিমালয়ের চূড়ো থেকে আসা নীল মেঘ ধারাবর্ষণ নামে।

জঙ্গল যেখানে হালকা হয়ে এসেছে সেখানে ভুটানিদের একটা ছোট বস্তি। দেশটা কিন্তু ভুটান নয়—বাংলাদেশের একেবারে উত্তরাঞ্চল। পাহাড়, ঝর্ণা, জঙ্গল আর চা-বাগান। চা আর কাঠের প্রয়োজনে একটু দূরেই ঘন বনের দিকে ছোট একটি রেললাইন—তার ওপর দিয়ে যে রেলগাড়ি চলে তা আরো ছোট। বুনো হাতি দেখলে ইঞ্জিন ব্যাক করে—শালগাছ পড়লে গাড়ির চলাচলতি বন্ধ থাকে। ননরেগুলেটেড অঞ্চল, থানা পুলিশের উপদ্রপটা গৌণ বস্তু! একজন সার্কল

অফিসার আছেন, কিন্তু তিনি কোথায় আছেন অথবা কী করেন সেটা নিরাকার ব্রহ্মের মতোই গুরুতর তত্ত্বচিন্তাসাপেক্ষ।

এইখানে—চা-বাগান কাঠের কারবার আর রেল লাইনের সীমানা থেকে কিছুটা দূরে সরে এসে, কুলবীরের পচাইয়ের দোকান। চা-বাগান আর কাঠ-কাটা কুলিদের প্রাণরস-সঞ্চয়ের কেন্দ্র। সন্ধ্যায় জঙ্গলের পথঘাট ভালো নয়, আপদ-বিপদের সম্ভাবনাও আছে। তবু কুলিরা এখানে আসে—দিনান্তে উগ্র মাদকতায় একটিবার গলা ভিজিয়ে না নিলে তাদের চলে না। কুলিদের রোজগার যে প্রচুর তা নয়, তবু দিন কাটে, চলে যায় একরকম করে।

রাত বাড়ছে। জঙ্গলের চাঁদ উঠে আসছে মাথার উপর। কোথা থেকে চিৎকার করছে হায়েনা। কুলিরা একে একে উঠে পড়ল সবাই, সাঁওতাল কুলিদের মাদলের শব্দ আর জড়িত গানের সুর ক্রমে মিলিয়ে এল দূরে। হঠাৎ কুলবীরের খেয়াল হলো, মেয়ে শিউলিকুমারী এখনো ফেরেনি। নদীতে জল আনতে গিয়েছিল, তারপর—

কুলবীরের মনটা ছলকে উঠল। জানোয়ারের পাল্লায় পড়েনি তো? ঝকঝকে ভোজালিখানা খাপে পুরে নিয়ে সবে বেরিয়ে পড়তে যাবে এমন সময় এল শিউকুমারী। একা নয়, কাঁধে ভর দিয়ে আসছে মহীতোষ। আর আসছে বললেই কথাটা ঠিক হয় না, শিউকুমারী বয়ে আনছে তাকে।

কুলবীর অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। ছোট ছোট মঙ্গোলীয়ান চোখ দুটো বিস্ফারিত করে অস্ফুট গলায় বললে, চুপ। একে কিছু খেতে দিয়ে এখন শোবার ব্যবস্থা করে দাও বাবা। যা শোনাবার শুনো সকালে।

কুলবীরের একটা পা কাঠে তৈরি। ১৯৪১ সালের লড়াই ফেরত লোক সে। ফ্যান্ডার্স, কামানের গর্জন—ওয়েস্টর্ন ফ্রন্ট। শেলের টুকরোত বাঁ পাখানা হয়তো উড়ে গিয়ে ইংলিশ চ্যানেলেই আশ্রয় নিয়েছে।

যুদ্ধ থামল, কুলবীর ফিরে এল দেশে। ভুটান সরকার কিছু কিছু জমি-জমা দিলে, রাজভক্তির পুরস্কার। কিন্তু সেই জমি নিয়েই শেষকালে বাধল নানা গণ্ডগোল। বুড়ো কুলবীরের এসব ঝামেলা ভালো লাগল না। একদিন সকালে দুটো টাট্টু ঘোড়ার পিঠে সব চাপিয়ে দিয়ে, ভুটানের পাহাড় ডিঙিয়ে, জলঢাকার হিম-শীতল তীক্ষ্ণধারা পার হয়ে সে চলে এলো ডুয়ার্সের জঙ্গলে।

তারপর দিন কেটে চলেছে। ভালোয় মন্দে, ছোট বড় সুখ-দুঃখে। সাত বছরের মেয়ে শিউকুমারীর বয়স এখন উনিশ। দিনের পর দিন শক্তিহীন হয়ে পড়ছে কুলবীর, অথর্ব হয়ে পড়ছে। একটা পায়ের অভাব বুনো ঘোড়ার মতো তেজিয়ান শরীরেও শিথিলতা সঞ্চার হয়েছে খানিকটা। অনেকটা এই কারণেই এতদিন পর্যন্ত বিয়ে হয়নি শিউকুমারীর। বুড়ো বয়সে কুলবীরের অন্ধের যষ্টি।

রাত্রির অন্ধকারে দেখা যায়নি, এখন প্রথম সূর্যের আলোয় দিগন্ত দেখা যাচ্ছে

কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনালি চুড়ো। শালবনকে অত ঘন বিন্যস্ত বলে বোধ হচ্ছে না। পাহাড়ের রেখাটা গাঢ় নীলিমা দিয়ে আঁকা, রাশি রাশি কুঞ্চিত রোমের মতো ঘন জঙ্গল তার সর্বাঙ্গে বিস্তৃত হয়ে আছে।

হুঁকো হাতে দিয়ে দড়ির খাটিয়ায় বসে মহীতোষের ইতিহাস সবটা শুনল কুলবীর। চাপা তামাটে মুখখানার ওপর দিয়ে সংশয়ের নিবিড় ছায়া ছড়িয়ে পড়ল।

—এখানে কেমন করে তোমাকে থাকতে দেব বাবু? ইংরেজের মুলুক। আমার দেশ ভুটান হলে তো কথা ছিল না, কিন্তু এখানে—

পচাইয়ের একটা হাঁড়ি নিয়ে শিউকুমারী বেরিয়ে এল বাইরে। বন-জ্যোৎস্নায় যাকে অপরূপ স্বপ্নময়ী বলে মনে হয়েছিল, দিনের উজ্জ্বল আলোয় দেখা গেল ততটা সুন্দরী সে নয়। খর্ব নাসিকা, ছোট ছোট চোখ। পরনের উড়ানীটার রং বিবর্ণ। ফর্সা মুখখানার ওপরে স্বাভাবিক অযত্নের একটা মলিন রেখা পড়েছে, গলার খাঁজে কালো হয়ে জমে আছে ময়লা। অপগত ক্লান্তি সুস্থ শিক্ষিত মহীতোষের যেন স্বপ্নভঙ্গ হয়ে গেল। নিতান্ত সাধারণ, নিতান্তই পথে ঘাটে দেখা পাহাড়ি মেয়ে। বন-জ্যোৎস্না আর সোনালি অজগরের মতো খর-ধারের নদীর পটভূমিতে আলোর পাখা যে ভর দিয়ে নেমে এসেছিল, সে যেন নিতান্তই অন্য লোক।

মহীতোষ কোনো জবাব দিলে না কুলবীরের কথায়, জবাবটা দিলেন শিউকুমারী। বললে, না বাবা, বাঙালিবাবুকে ক'টা দিন রাখতেই হবে। এখন এখান থেকে বেরোলেই অংরেজ ধরে নেবে ওকে। তুমি স্বাধীন ভুটিয়া, স্বাধীন বাঙালিকে আশ্রয় দিতে আপত্তি করছো কেন?

এবার চমকাবার পালা মহীতোষের। আশ্চর্য, এমন একটি কথা এই নোংরা পাহাড়ি মেয়েটা বলতে পারল কী করে? একি স্বাধীন পাহাড়ি রক্তের থেকে স্বতোৎসারিত অথবা এই আরণ্যকে উন্মুক্ত পৃথিবীর প্রভাব? মহীতোষ তাকিয়ে রইল শিউকুমারীর দিকে। সুগঠিত দেহ—লালিত্যের চাইতে দৃঢ়তা বেশি। ছোট ছোট চোখ দুটোতে শানিত দৃষ্টি। কানে রুপোর দুটো প্রকাণ্ড আভরণ—বাঙালি মেয়ের নরম কান হলে ছিঁড়ে নেমে পড়ত। এক লহমায় মনে হলো ভুটানের স্বাধীন সৈনিকের জন্ম দেবার অধিকারিণী বীরমাতাই বটে।

কিন্তু কথাটা কুলবীরের মনে ধরেছে। স্বাধীন জাত—প্রতিদিন বিদেশি শৃঙ্খলের অপমান বয়ে বেড়াতে হয় না। তা ছাড়া নিজে লড়াই করেছে কাদামাখা বোমাবিধ্বস্ত ট্রেঞ্চে, ফাটা শেলের ফুলঝুরিতে, রাশি রাশি বুলেটের মধ্যে, বেয়নেটের ধারালো ফলায়। সৈনিকের মর্যাদা সে বোঝে। আর তা ছাড়া মহীতোষও সৈনিক বই কি! স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যে সে সৈনিক।

কুলবীর চিন্তিত মুখে হুঁকোয় টান দিয়ে বললেন, আচ্ছা থাকো। এখন কোনো ভয় নেই—এবেলা লোকজনের আমদানি হয় না জঙ্গলে। কিন্তু বিকেলে চা-বাগান থেকে সব আসে, তাদের সামনে পড়লে বিপদ হতে পারে।

শিউকুমারী বললেন, সে তোমাকে ভাবতে হবে না বাবা, আমি ঠিক করে নেব।

মহীতোষ কৃতজ্ঞ গাঢ় চোখে একবার তাকাল শিউকুমারীর আনন্দিত উজ্জ্বল মুখের দিকে। অস্পষ্ট গলায় বললে—তোমার দয়া থাপাজী।

—না, না, দয়া আর কিসের। এসেছ, থাকো দুদিন।—কুলবীর অল্প একটু হাসল, তারপর কাঠের পায়ে খটখট করে ঘরের ভেতরে চলে গেল। আশ্রয় দিয়েছে, কিন্তু সংশয় কাটছে না।

থাকার অনুমতি মিলল, কিন্তু মহীতোষ ভাবতে লাগল, থাকা কি সত্যিই সম্ভব। পাহাড়িদের ছোট ছোট কুঁড়েঘর—ঝোপড়ি দড়ির খাটিয়া। পচাইয়ের উগ্র দুর্গন্ধ। চারদিকে নীল জঙ্গল, সমস্ত পৃথিবীকে দৃষ্টির আড়ালে সরিয়ে রেখে কারাগারের মতো দাঁড়িয়ে আছে। বাইরের প্রকাণ্ড বিক্ষুব্ধ জগৎটাকে ইতিহাসের দ্রুত আবর্তনের সঙ্গে কী যে ঘটে চলেছে তা এখান থেকে জানার বা অনুমান করার উপায় নেই। একি আশ্রয়, না আন্দামানে নির্বাসন?

শিউকুমারী এগিয়ে এল। পাহাড়ি মেয়ের সহজ নিঃসংশয়তায় একখানা হাত রাখল মহীতোষের বাঁধের ওপর। বললে, বাঙালিবাবু কী ভাবছো?

মহীতোষ অন্যমনস্কভাবে বললে, কই, কিছুই তো ভাবছি না।

—না, কিছুই ভাবতে হবে না। কোনো ভয় নেই তোমার, অংরেজ এখানে তোমাকে খুঁজে পাবে না।

মহীতোষ ম্লান হাসল : ঠিক জানো তুমি?

—জানি বই কি! কিন্তু এখানে থাকতে হলে তো বসে বসে ভাবলে চলবে না। কাজ করতে হবে। চলো, জঙ্গল থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনি।

একটা কিছু করার সুযোগ পেয়ে যেন হালকা হয়ে গেল অনিশ্চিত অস্বস্তির বোঝাটা! মহীতোষ উঠে দাঁড়াল, বললে—চলো।

শালবনের পথে। নিচের দিকটা দাবানলে জ্বলে গেছে এখানে ওখানে। শাল-শিশুরা আগুনে পুড়ে গিয়ে কালো কতগুলো খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে। কিন্তু আগুনে পুড়ছে বলেই ওরা মরবে না। এ হচ্ছে ওদের জীবনীশক্তির প্রথম পরীক্ষা, ভাবীকালে বনস্পতি হওয়ার গৌরব লাভ করার পরে প্রথম অগ্নি-অভিষেক। তিন চার বছর দাবানল ওদের ডাল-পাতা পুড়িয়ে নির্জীব করে দেবে, কিন্তু তার পরেই অগ্নিউপাসক ঋত্বিকের মতো নির্দাহন শক্তি লাভ করবে ওরা। দিনের পর দিন ওরা বড় হয়ে উঠবে—ঋজু হয়ে উঠবে—নিজেদের বিস্তীর্ণ করে দেবে, ডুয়ার্স থেকে টেরাই পর্যন্ত।

ডালে ডালে পাখি। চেনা-অচেনা, নানা জাতের, নানা রঙের। ময়ূর আর বনমুরগির ছুটোছুটি। চকিতের জন্য দেখা দিয়েই বিদ্যুতের মতো মিলিয়ে যায় হরিণের পাল। এখান-ওখান দিয়ে ঝোরার জল। দু'পাশে সবুজ ঘন-বিন্যস্ত

ছোপ, বড় বড় ঘাস, অসংখ্য বুনো ফুল। পায়ে পায়ে ভুঁই চাঁপার নীল-বেগুনি মঞ্জরী।

কাঠ আর শুকনো পাতা কুড়িয়ে চলেছে দুজনে। বেশ লাগছে মহীতোষের। জীবনের রূপটা যে এত বিচিত্র, এমন মনোরম এ কথা আগে কি কখনো কল্পনা করতে পারত মহীতোষ? কিন্তু আর নুয়ে নুয়ে খড়ি কুড়োতে পারা যায় না। পিঠটা টন টন করছে।

শিউকুমারী ডাকল, বাঙালিবাবু?

মহীতোষ চোখ তুলে তাকালো : কী বলছো?

—হাপিয়ে গেছ তুমি। এসব কথা কী তোমাদের পোষায়? এসো, জিরিয়ে নিই।

একটা শালগাছের গোড়ায় শুকনো পাতার স্তূপের উপর বসল দুজনে। নীল, ঠাণ্ডা ছায়া, খসখসে শালের পাতায় বাতাসের শিরশিরানি। ঘুঘু ডাকছে। ভুঁই চাঁপার ওপর উড়ে বসছে নানা রঙের বুনো প্রজাপতি। গাছের ডালে ডালে বানর লাফিয়ে চলে যাচ্ছে। শান্ত, সুন্দর, ঘুমন্ত অরণ্য। হিংস্র রাত্রির অবসানে জানোয়ারেরা হয়তো ঝোঁপ আর ঘাসবনের ভেতরে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে আছে এখন।

শিউকুমারী আস্তে আস্তে বললে, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে বাঙালিবাবু।

মহীতোষ দীর্ঘশ্বাস ফেলল : না, কষ্ট আর কিসের?

—কষ্ট নয়? দেশ-গাঁ ছেড়ে কোথায় এসে পড়েছ। এখানে জঙ্গল, আমরা জংলী মানুষ। এ তোমার ভালো লাগার কথা নয়।

মহীতোষ মৃদু হাসল : কিন্তু ইংরেজের জেলের চাইতে অনেক ভালো নিশ্চয়ই।—

—তা সত্যি।

শিউকুমারীর মনটা হঠাৎ ভাবাতুর হয়ে উঠল। শুধু এইটুকুই ভালো, ইংরেজের জেলের চাইতে অনেক অনেক ভালো? তার চাইতে আরো কিছু ভালো নেই কি এখানে? জঙ্গলের শান্ত স্নিগ্ধ ছায়া—হাওয়ায় ঝরে-পড়া শালের ফুল। রাত্রিতে মাতালকরা বন-জ্যোৎস্না। জলঢাকার কলরোল। কাঞ্চনজঙ্ঘার সোনার মুকুট। দূরের পাহাড়ে পাথর কাটা পথের ওপর যখন জংলা কলার পাতা হাওয়ায় কাঁপে, জানোয়ারের পায়ে লেগে গড়িয়ে-পড়া পাথরের শব্দে মনে হয় দূরবাসী পিতম ঘোড়া ছুটিয়ে অভিসারে আসছে, তখন শিউকুমারীর ইচ্ছে করে—

কিন্তু শিউ কুমারীর যে ইচ্ছে করে, সে ইচ্ছে মহীতোষের নয়। শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষ। ছাব্বিশে জানুয়ারি। কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রাত্রির তপস্যা। আগস্ট আন্দোলন—ডু আর ডাই। সেই জগৎ থেকেই সেই আন্দোলিত আবর্তিত বিপুল জীবন থেকে কোথায় ছিটকে পড়ল সে? বিক্ষুব্ধ বোম্বাই—উন্মত্ত কলকাতা। পথে পথে 'বন্দেমাতরম। লাঠি, বন্দুক, রক্ত, আইন। চোখের সামনে ছায়াছবির মতো

ঘুরে যায় সমস্ত। সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে—সেই গর্জিত সমুদ্রের তরঙ্গে আফ্রিকার বনভূমির শিলাসৈকতের মতো জীবন একটা অজ্ঞাত তটে নিক্ষিপ্ত হয়েই পড়ে থাকবে? আকাশে যেখানে ঘূর্ণিত নক্ষত্রমালায় আর জ্বলন্ত নীহারিকায় ভাঙা-গড়ার প্রলয় চলেছে, সেখান থেকে কক্ষভ্রষ্ট হয়ে মৃত্যু-সমুদ্রের মধ্যে তলিয়ে থাকবে নিবে-যাওয়া উল্কা?

মহীতোষ বললে, দয়া করে আশ্রয় দিয়েছ তোমরা। এ ঋণ কী করে শোধ হবে জানি না।

—দয়ার ঋণ আমরা শোধ নিই না বাঙালিবাবু—শিউকুমারীর গলার স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল : সে আমাদের নিয়ম নয়। কিন্তু চলো, বেলা উঠে গেল।

খোঁচা খেয়ে পরিতোষ আশ্চর্য হয়ে গেল। এক আকস্মিক তীক্ষ্ণতার অর্থ কী? ডুয়ার্সের জঙ্গলের মতোই জংলী মেয়ের চরিত্র বোঝার চেষ্টা করা বৃথা।

ছোট কাঠের বোঝাটা মহীতোষ তুলে নিলেন নিঃশব্দে।

শালবনের ছায়ামেদুর কবিতায় ছন্দপতন হয়ে গেছে। দূরে পাহাড়ের গায়ে বুনো হাতির ডাক। জলঢাকার কলগর্জন ছাপিয়ে মেঘমন্দ্রের মতো সে ডাকে ভেসে এল কক্ষভ্রষ্ট উল্কা। কিন্তু নিবতে চায় না—বুকের মধ্যে জ্বলতে থাকে অবিরাম। তবু উপায় নেই, থাকতে হবে; অন্তত ক'টা দিনের জন্য আশ্রয় নিতে হবে—যে পর্যন্ত অরবিন্দ ফিরে না আসে। আর মহীতোষ জানে, মনের দিক থেকে নিশ্চিন্তভাবেই জানে অরবিন্দ ফিরে আসবেই। যেখানে যাক, যেমন করে থাক, তাকে খুঁজে বার করবেই। মৃত্যুর হাত এড়ানো চলে, কিন্তু অরবিন্দের চোখ এড়াবার উপায় নেই। তার দুটো চোখ যেন লক্ষ লক্ষ হয়ে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস-অরণ্যে ছড়িয়ে পড়ে আছে।

তবু দিন কাটে। খড়ি কুড়োয়, কুলবীরের গাদা বন্দুক নিয়ে বন-মুরগির শিকার করে, হরিণের সন্ধান করে। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে মনে হয় এখনি হয়তো কোথা থেকে একটা ছায়ামূর্তির মতো অরবিন্দ সামনে চলে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু অরবিন্দ আসে না। যেখানে সেখান থেকে বনলক্ষ্মীর মতো দেখা দেয় শিউকুমারী। কাঁখে কলসী, ভিজে শাড়ি সুললিত দেহের খাঁজে খাঁজে ভাঁজে ভাঁজে জড়িয়ে রয়েছে। মৃদু হেসে চোখের তীব্র চাহনি হেনে বলে, শিকার মিলল?

থমকে দাঁড়িয়ে যায় মহীতোষ। দৃষ্টিটাকে বন্দি করে ফেলে শিউকুমারীর অনিন্দ্য দেহসুষমা। মনে রং লাগে। নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে আসে অবচেতনার স্বীকারোক্তি : মিলল বলেই তো মনে হচ্ছে।

শিউকুমারীর দৃষ্টিতে আগুন জ্বলে যায় : সত্যি?

—সত্যি।—যেন অদৃশ্য শয়তানের শৃঙ্খলে টান লাগে, এক পা এক পা করে এগিয়ে যায় মহীতোষ : অনেক খুঁজে এইবার পাওয়া গেল বলে ভরসা হচ্ছে।

শিউকুমারী আর দাঁড়ায় না। দেহভঙ্গিমার উন্মত্ত আলোড়ন রক্তের কণায় কণায় জাগিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে অদৃশ্য হয়ে যায় জঙ্গলের মধ্যে। আর পরক্ষণেই যেন দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে যায় মহীতোষের। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়, মনে হয় একান্তভাবে ব্রতচ্যুত, যোগভ্রষ্ট। শেষপর্যন্ত এই দাঁড়াল ছাব্বিশে জানুয়ারির সঙ্কল্প ভুলে গিয়ে পাহাড়ি মেয়ের মেয়ের সঙ্গে বনে বনে প্রেম করে বেড়াচ্ছে সে?

দু'হাতে মাথাটা চিপে ধরে মহীতোষ। নাঃ আর নয়। এ কোন জালে দিনের পর দিন জড়িয়ে পড়ছে সে? স্বাধীনতার সৈনিক—শৃঙ্খলিত ভারতবর্ষের কান্নায় কন্যাকুমারী থেকে গৌরীশেখরের তুহিন শৃঙ্গ অবধি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। একি মোহ তার! এইভাবেই সে কি তার কর্তব্য পালন করছে?

বিকেল থেকে রাত নটা পর্যন্ত পচাই-লোভী কুলি আর পাহাড়িদের আড্ডা বসে কুলবীরের দোকানে। কাঠের পা নিয়ে কুলবীর একা সব দেখাশোনা করতে পারে না, শিউকুমারী কাজে সহায়তা করে তার। মৃদু হাসির সঙ্গে ক্রেতার দিকে এগিয়ে দেয় পচাইয়ের ভাঁড়। মনে রং লাগে, নেশার রং শিউকুমারীর চোখের রং। ভুল করে খরিদ্দারেরা বেশি পয়সা দিয়ে ফেলে।

আর সেই সময়ে কুলবীরের একটা ঢোলা হাফ-প্যান্ট পরে ঘরের পেছনে একটা চৌপাইয়ের ওপরে স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে মহীতোষ। এই সময়টাই তাকে অজ্ঞাতবাস করতে হয়। কুলিরা আসে, কুলীদের সর্দার আসে। ফরেস্ট-অফিসের দু-চারজন আধা-বাবুরও পদপাত ঘটে। ওখানে থেকে হৈচৈ শোনা যায়, হুল্লোড় শোনা যায়, দুর্বোধ্য গানের কলি শোনা যায়, উন্মত্ত হাসিতে কুলবীরের ছোট ঝোপড়িটা যেন থরথর করে কেঁপে ওঠে। আর সবকিছুর ভেতর দিয়ে একটা তরল তীক্ষ্ণ হাসি বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ে—শিউকুমারী হাসছে।

মোহ কাটাতে চায় মহীতোষ। কিন্তু মোহ কি সত্যিই কাটে? শিউকুমারী হাসছে—পাহাড়ি মেয়ে পচাই বিক্রির খরিদ্দারের খুশি করার জন্য তার অভ্যস্ত হাসি হাসছে! তাতে মহীতোষের কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু সত্যিই কি ক্ষতি নেই? তা হলে বুকের মধ্যে জ্বালা করে কেন, কেন মনে হয় শিউকুমারী তাকে ঠকাচ্ছে?

বন-জ্যোৎস্না শেষ হয়ে গেছে, এসেছে অমাবশ্যা, আরণ্যক তমসা। অন্ধকারের মধ্যে মহীতোষ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে, ঝাঁকে ঝাঁকে মশা এসে ছেঁকে ধরে তাকে। বুকের মধ্যে অসহায় কান্নার রোল ওঠে—অরবিন্দ, অরবিন্দ? এমন সময় তাকে ফেলে কোথায় চলে গেল অরবিন্দ?

নিজে চলে যাবে? এখুনি চলে যাবে এই কালো অন্ধকার ঘেরার শালবনের ভেতর দিয়ে, কালিমাখা জলঢাকার তীক্ষ্ণধারা পার হয়ে? কিন্তু মন তাকেও পায় না। কে যেন তার সমস্ত শক্তি নিঃশেষে কেড়ে নিয়েছে। একা চলে যেতে ভয় করে, ভয় করে আবার কোনো একটা নতুন অনিশ্চয়তার মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে

পড়তে। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়িদের এই ছোট ঘরেই কি সে চিরতরে বাঁধা পড়ে গেল, হারিয়ে ফেলল পথচলার ক্ষমতা? অরবন্দি—এ সময়ে যদি অরবিন্দ থাকত।

কুলবীরের দোকানে কলরব ক্রমশ আসছে। শিউকুমারীর হাসির আওয়াজ আর শোনা যায় না। শুধু মাঝে মাঝে ঠুন ঠুন করে মিষ্টি শব্দ। কাঠের বাক্সের ওপর বাজিয়ে বাজিয়ে পয়সা গুনছে কুলবীর।

হঠাৎ কেরোসিনের টেমির আলো এসে মুখে পড়ে মহীতোষের। প্রদীপ হাতে বনরাজ্যের মালবিকা। চোখে সকৌতুক দৃষ্টি : চলো বাঙালিবাবু ঘরে চলো। ওরা পালিয়েছে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো মহীতোষ উঠে পড়ে। ঠিক প্রথম দিনটির মতোই হাত বাড়িয়ে দেয় শিউকুমারী; এসো, এসো!

আর কিছু মনে থাকে না। একটু আগেকার তীব্র হাসির জ্বালাটাও তেমনি করে আর কানের মধ্যে বিঁধতে থাকে না। এই মেয়েটি কি ওকে সম্মোহিত করে ফেলেছে!

দিন কাটছিল—কিন্তু আর কাল না। জীবনের অপরিহার্য জটিলতা এসে দেখা দিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে পচাইয়ের দোকানে কাঠের কারবারী বলদেও আবির্ভূত হলো একমুখ কুটিল হাসি বিস্তার করে বললে—ভালো আছো শিউ?

শিউকুমারীর গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল, কুলবীর তাকাল সন্দিগ্ধ ভীত দৃষ্টিতে। সাংঘাতিক লোক বলদেও। পচাইতে আর নেশা নেই—কোনো মতলব না থাকলে এদিকে পা দিত না সে। কিন্তু কী সে মতলব?

কুলবীর অনুমান করার চেষ্টা করতে লাগল।

বলদেও প্রতিপত্তিশালী লোক। যেমন কুটবুদ্ধি, তেমনি নির্মম। তাকে ভয় না করে এমন লোক নেই। তবু শিউকুমারী ভয় করেনি তাকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে হাত চেপে ধরে প্রণয় নিবেদন করেছিল বলদেও। বলেছিল যত টাকা চাস—

কিন্তু কথাটা শেষ হয়নি। প্রকাণ্ড চড়টার বিভ্রম থেকে আত্মস্থ হয়ে প্রাণীরও চিহ্ন নেই। শুধু নদীর গর্জন পরিহাসের মতো বাজছে।

টাট্টু ছুটিয়ে বলদেও চলে গিয়েছিল। কিন্তু চড়ের জ্বালাটা যে সে ভোলোনি, সহজে ভুলবেও না—একথা শিউকুমারীও জানত।

বিবর্ণ মুখে শিউকুমারী বললে, ভালোই আছি।

—হুঁ, খুব ভালো আছো বলেই মনে হচ্ছে?—আবার নির্মমভাবে বলদেও হাসল। ছোট ছোট চোখ দুটোয় ঝিকিয়ে উঠল পাহাড়ি প্রতিহিংসার সর্পিল চমক।

বলদেও নেশা করে না সহজে। কিন্তু আজ তার কি হয়েছে ভাঁড়ের পর ভাঁড় নিঃশেষ করে চলল সে। একটা দশ টাকার নোট কুলবীরের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে—চালিয়ে যাও থাপাজী।

রাত বেড়ে চলল! একে একে খরিদ্দারেরা চলে গেল সবাই! কিন্তু বলদেও ওঠে না। অধৈর্য হয়ে টাট্টু ঘোড়াটা পা ঠকুছে বারে বারে, লেজের ঘা দিয়ে মশা তাড়াচ্ছে। জঙ্গলের পথে বুনো জানোয়ারটাকে ভয় করে না বলদেও। অমিত শক্তিমান লোক—ভোজালীর ঘায়ে বাঘ মারতে পারে!

কী একটা কাজে কুলবীর ঘরের মধ্যে ঢুকতেই বলদেও এগিয়ে এল। শিউকুমারীর চোখের ওপর রক্তাক্ত হিংস্র চোখ দুটো স্থির বিদ্ধ করে বললে—ফেরারী আসামিকে ঘরে জায়গা দিয়েছ?

পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত থর থর করে কেঁপে গেল শিউকুমারীর : কে বলেছে তোমাকে?

—আমাকে ফাঁকি দেবে তুমি?—মুষ্টিগত শিকারের অসহায় মুখের দিকে তাকিয়ে পরিতৃপ্ত জিঘাংসার আনন্দে বলদেও বললে, সাত সাতটা চোখ আছে আমার। কালই খবর যাবে ফাঁড়িতে : শুধু ওই বাঙালিবাবু নয়, হাতে দড়ি পড়বে তোমার, দড়ি পড়বে থাপাজীর!

শিউকুমারী আর্তনাত করে উঠল!

বলদেও বললে—শোনো শিউ। এ খবর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। আমি তোমাদের বাঁচাতে পারি, রেয়াৎ করতে পারি বাঙালিবাবুকেও। কিন্তু দয়া করে নয়। আজ রাতে আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব। যদি আসো, কোনো ঝামেলা হবে না। যদি না আসো, কাল সক্কলকে ফাটকে যেতে হবে।

শিউকুমারী তাকিয়ে রইল নির্বাক চোখে।

বলদেও খাপ থেকে বার করলে ঝকঝকে ভোজালিখানা, যেন উদ্দেশ্যহীনভাবেই তার ধার পরীক্ষা করলে একবার। বললে—টাকার জন্য ভেব না। আমাকে খুশি করতে পারো তো যা চাও তাই দেব! যুদ্ধের বাজারে ব্যবসা করছি জানো হয়তো! কিন্তু আজ রাতের কথা যেন মনে থাকে। যদি না যাও কাল সকালে যা হবে, তার জন্য আমাকে দোষ দিও না।

বলদেও টলতে টলতে উঠে পড়ল ঘোড়ায়। সাত সেলের তীব্র একটা হান্টিং-টর্চের আলোয় অরণ্য উদ্ভাসিত করে দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল।

কিন্তু এত ব্যাপার জানল না মহীতোষ। দড়ির খাটিয়ায় সে তখন অঘোর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। বাইরের শালের পাতায় মর্মর তুলে বয়ে যাচ্ছে বাতাস, ঝোপড়ির ফাঁকে ফাঁকে স্নেহস্পর্শ বুলিয়ে দিচ্ছে তার সর্বাঙ্গে। স্বপ্ন দেখছে সে। কিসের স্বপ্ন? ছাব্বিশ জানুয়ারির নয়, নাইনথ আগস্টেও নয় পতাকাবাহী উন্মত্ত জনতার তরঙ্গবেগ কোথায় চাপা পড়ে গেছে বিস্তৃতির অতলতায়। জলঢাকার খরখরে বালির ওপর বন-জ্যোৎস্না। চোখে-মুখে জলের ছাট দিয়ে যে উড়ানির বাতাস দিচ্ছে, সে কি কোনো মর্মর মূর্তি? অথবা আকাশ থেকে স্বপ্নের পাখায় ভর দিয়ে নেমে-আসা কোনো আলোক-পরী?

চমকে ঘুম ভেঙে গেল। বুকের ওপরে যে যেন আছড়ে পড়েছে এসে। বড় বড় নিশ্বাস মুখের ওপর এসে পড়ছে—অনুভব করা যাচ্ছে তার উত্তেজিত প্রসরণশীল হৃৎপিণ্ডের উৎক্ষেপ। কেরোসিনের টেমির আলোয় মহীতোষ দেখলে শিউকুমারী!

—চলো, পালাই আমরা! আমাকে নিয়ে চলো তুমি!

আকস্মিক উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হয়ে মহীতোষ দু'হাতে পাহাড়ি মেয়েটিকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে—কোথায় যাব?

শিউকুমারীর যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে; অসহ্য আবেগে থরথর করে গলা কাঁপছে তার : যেখানে তোমার খুশি।

মহীতোষ ক্রমশ আত্মস্থ হয়ে উঠছে : কিন্তু কী করে নিয়ে যাব তোমাকে? এখান থেকে শুধু হাতে তো পালানো চলে না। পদে পদে বিপদ। সেসব এড়াবার জন্য টাকা দরকার। অনেক দূর দেশে তো যেতে হবে, টাকা নইলে চলবে কী করে?

টাকা! শিউকুমারী উঠে বললে : কত টাকা চাই তোমার?

দুশো-তিনশো। তাহলে তোমাকে নিয়ে সিকিম চলে যেতে পারবো, চলে যেতে পারবো একেবারে গ্যাংটকে। সেই ভালো, সেখানে গিয়ে ঘর বাঁধব আমরা। যে পেছনে পড়ে আছে, পেছনেই পড়ে থাক—মহীতোষের যেন নেশা লেগেছে : নতুন করে জীবন শুরু করব আমরা।

দুশো-তিনশো। শিউকুমারী পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল কোথায় পাওয়া যাবে এত টাকা? কুলবীরের বাক্স হাতড়ালে কুড়িটা টাকার বেশি একটা আধলাও পাওয়া যাবে না, এ কথা তার চাইতে ভালো করে আর কে জানে!

মহীতোষ লোভীর মতো তার দিকে হাত বাড়াল।

কিন্তু সরে দাঁড়াল শিউকুমারী! দুশো টাকা। বলদেও আজ সারা রাত প্রতীক্ষা করে থাকবে। চিন্তাগুলো একসঙ্গে আগ্নেয়গিরি গলিত ধাতু পুঞ্জের মতো ফুটতে লাগল। মাত্র একবার। একটি রাত্রির অশুচিতা। তারপর সে জীবনে আসবে, তার পবিত্র নির্মল স্রোতে ধুয়ে যাবে সমস্ত, মুছে যাবে সমস্ত গ্লানি আর দুঃস্বপ্নের স্মৃতি।

মহীতোষ বললে, বুকে এসো।

—টাকার যোগাড় করে আনছি—ঘর থেকে মাতালের মতো বেরিয়ে গেল শিউকুমারী। চিন্তার মধ্যে আগুন জ্বলে যাচ্ছে—যেন একপাত্র চড়া মদ খেয়েছে সে। দুষ্টু ক্ষুধা বলদেওয়ের। এক রাত্রের জন্য তিনশো টাকা খরচ করবে, এমন বেহিসেবী সে নয়। প্রতিশোধ নেবার জন্য, যতদিন শিউকুমারীর যৌবন থাকে, ততদিন তাকে দলিত মথিত করে লুটে নেবার জন্যই বলদেওয়ের এই কৌশল। এই ফাঁদে আরো অনেকেই পড়েছে।

কিন্তু শিউকুমারীর পক্ষে মাত্র এক রাত্রি। সমস্ত জীবনের জন্য একটি রাত্রির চরমগ্লানি চূড়ান্ত অপমানকে মেন নেবে সে। তারপর কাল, পরশু? তখন হয় তো তারা ভুটানের পাহাড় পেরিয়ে চলেছে সিকিমের দিকে। সমস্ত শিরায় শিরায় তীব্র

জ্বরের জ্বালা নিয়ে ডিলিরিয়ামের রোগী যেমন উঠে বসতে চায়, ছুটে যেতে যায়, তেমনি করেই শিউকুমারী অন্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আর বিছানার ওপরে বিহ্বল হয়ে বসে রইল মহীতোষ! তার রক্তে রক্তে একি আশ্চর্য দোলা! যেন নিশি পেয়েছে তাকে। তার নিজের অতীত—তার জীবনের সঙ্কল্প সব মিথ্যা আর মায়া হয়ে গেছে। নতুনের আহ্বান—বহু বিচিত্র—বহু ব্যাপক অনাস্বাদিত জীবনের আহ্বান। এই পুলিশের তাড়া—এই বিব্রত বিড়বিড় মুহূর্তগুলো—এদের ছাপিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে ক্ষতি কী, ক্ষতি কী নিজেকে ভাসিয়ে দিলে আশ্চর্য একটা অ্যাডভেঞ্চারের সমুদ্রে?

চাপা গলায় মহীতোষ ডাকলে, শিউ শিউ!

কিন্তু শিউ এলো না, এলো অরবন্দি। সত্যিই অরবিন্দ জঙ্গলের মধ্যে থেকে উঠে এলো অমানুষিক মানুষ। মহীতোষের সর্বাঙ্গ দিয়ে যেন বরফগলা জলের শিহরণ নেমে গেল।

মহীতোষের মুখের ওপরে টর্চের আলো ফেলে বজ্রগর্ভ কঠিন আদেশের গলায় অরবিন্দ বললে—অনেক খুঁজে তোমার সন্ধান পেয়েছি। কিন্তু এখানে বসে বসে একটা পাহাড়ি মেয়ের সঙ্গে প্রেম করা ছাড়াও ঢের কাজ আছে তোমার। উঠে পড়ো।

বিহ্বল ভীত গলায় প্রশ্ন এলো কোথায়?

—পঁচিশ মাইল দূরে। ভালো শেলটার আছে, দলের লোক আছে। ওখানে থেকে শহরের আন্ডার-গ্রাউন্ড ওয়ার্ক বেশ করা চলবে। উঠে পড়ো।

—এখনি?

—হ্যাঁ এখনি। মুখের মধ্যে দাঁতগুলো কড়কড় করে উঠল অরবিন্দের। বাঁ হাতে দেখা দিল ছোট একটা কালো রিভলভার : দিন রাত পাহাড়িদের ঘরে কাটিয়েই কি আয়েসী হয়ে গেলে নাকি?

মহীতোষ কলের পুতুলের মতো উঠে দাঁড়াল। রিভলভারের সংকেতটা অত্যন্ত স্পষ্ট।

অরবিন্দ বললে—বাইরে বড় ঘোড়া তৈরি আছে। দুজনাকে এক ঘোড়ায় উঠতে হবে। হারি আপ!

টর্চের আলো নিবে গেল। ঝোপড়ির মধ্যে নিঃসঙ্গ অন্ধকারে পচাইয়ের গন্ধ ছড়িয়ে পড়তে লাগল। দূরে ঝম ঝম করে প্রচণ্ড শব্দে ভটিয়ারা ঝাঁঝি বাজাচ্ছে—অপদেবতাকে তাড়াবার চেষ্টা করছে তারা। ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দে কি অপদেবতার পদধ্বনিও মিলিয়ে এল?

চরম লাঞ্ছনা আর মর্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে সংগ্রহ করা তিনশো টাকার নোট। শিউকুমারীর হাতের মধ্যে ঘামে ভিজছে নোটের তাড়াটা। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে সে। কালো অন্ধকারে একহাত দূরের মানুষ চোখে

দেখা যায় না। শালের পাতায় শিরশিরানি—এখানে ওখানে বন্যজন্তুর আগ্নেয় নয়ন।

মহীতোষ—এই কালো অন্ধকারে কোথায় মহীতোষকে খুঁজে পাবে শিউকুমারী? অরণ্য তাকে গ্রাস করেছে, নিঃশেষে তলিয়ে নিয়েছে নিজের মধ্যে। তবু অন্ধকারে শিউকুমারী খুঁজে ফিরছে। শালের চারায় পা কেটে রক্ত পড়ছে—কাঁটায় ছড়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ। এতো অন্ধকার এমন দুচ্ছেদ্য তমসায় একটুখানি আলো যদি পাওয়া যেত!

আলো পাওয়া গেল। ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্রতর। পটপট করে পাতা পোড়াবার শব্দ—বন-মুরগির ভীত কলরব চারিদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে।

বন-জ্যোৎস্না নয়, দাবাগ্নি।